কোথায় স্বাধীনতা

মীজান রহমান

সবাই একই কথা বলে। দোষ ধর্মের নয়, ধর্মীর।

রামের নামে উড়িষ্যার খৃষ্টান পাড়ায় আগুন জ্বালানো হয়। দোষ রামের নয়, রামভক্তের।

কালীমন্দিরে নরবলি হত একসময়। মা-কালীর দোষ নয়, দোষ কালীভক্তের।

আল্লার নামে যুবতীকে হত্যা করা হয় পৈশাচিক প্রস্তরাঘাতে, বিধর্মীর মুণ্ডচ্ছেদ হয় প্রকাশ্য দিবালোকে। দোষ আল্লার নয়, বান্দার।

ঈশ্বরের কল্পিত ইশারাতে ইজরায়েলের ইহুদীরা আরব চাষীদের জমি কেড়ে নেয়। দোষ ঈশ্বরের নয়, ইহুদীর।

আমেরিকার পরাক্রান্ত গান লবিরও একই যুক্তি। মারণাস্ত্র মারে না, মানুষ মারে।

শাস্ত্রে বলে ইচ্ছাটা তাঁর, কাজটা মানুষের। ভালটা তাঁর গুণে, মন্দটা তার দোষে। মানুষের আসল নাম নন্দ ঘোষ।

বিজ্ঞানীরা আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছেন জ্ঞানের খাতিরে। রাজনৈতিক নেতারা তাকে ব্যবহার করেছেন ক্ষমতার খাতিরে। সবকিছুরই মূল সেটা—ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ। রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে জাতিকে। ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে মনকে। মানুষ, সাধারণ মানুষ, খেটে-খাওয়া মানুষ, যে-কোন মানুষ, নিয়ন্ত্রিত হতে ভালবাসে। মানসিক দাস্যতা আমাদের আদিম প্রকৃতি। নিয়ন্ত্রিত হতে হতে একসময় আমরা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠি। প্রথমে সবল নিয়ন্ত্রণ করে দুর্বলকে। পরে ক্ষমতা হাতে এলে দুর্বল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে সবলকে। সবল আর দুর্বলের ব্যবধান একটা হালকা আবরণ মাত্র। একে অন্যের পরিপন্থী নয়, অণুপন্থী।

মানুষ কি তার সৃষ্টির চেয়ে বড় ? কে বেশি শক্তিশালী ? মতবাদ না মানুষ ? মতবাদ কি একটা অস্ত্রের নাম, না একটা মূল্যবান দেয়ালছবির ? স্রষ্টা কি একটা মতবাদ, না দ্রব্য, না কোনও বিশাল কল্পনা ? তিনি কি সৃষ্টির বাইরে ? অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর সবই সৃষ্ট বাস্তবতা ? তাহলে স্রষ্টা কি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে ?

একজাতির মুক্তিযোদ্ধা আরেকজাতির দুষ্কৃতকারী। একজনের বীরসন্তান আরেকজনের দুর্বৃত্ত। '৭১এ পাকিস্তানের বন্দুক আর কামান বাংলাদেশে গিয়েছিল ইসলামের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে, আল্লার রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনাতে। সেই বীজের ফসলকে এখন কেউ ইসলাম বলে না, বলে অবৈধ সন্তান। অবাঞ্ছিত যুদ্ধশিশু। সমাজের বর্জ্যদ্রব্য।

ক্ষমতার লড়াই এক নেতাকে রাজত্ব দেয়, আরেক নেতাকে করে রাজ্যহীন। জনসেবার নামে ক্ষমতা কখনোবা জনপদকে জনশূন্য করে দেয়। আকাল সৃষ্টি করে, অনাহার, মৃত্যু আর হাহাকার আনে। ক্ষমতা মানুষকে স্বৈরাচারি করে, তার মনুষ্যত্ব হরণ করে। ইতিহাসব্যাপী তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। তবু মানুষ বারবার স্বৈরাচারির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্ষমতার প্রতি একরকম যুক্তিহীন অসুস্থ ভক্তি বোধহয় মানুষের জৈব প্রকৃতি। ইরাকের সাদ্দাম হুসেন ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাবার পর হিরোহারা জাতির কাছে শহীদ হিরো হয়ে উঠেছেন। তাঁর সমাধিস্থল জনগণের পুণ্য তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। জার্মানীর উন্মাদ চ্যান্সেলার হিটলার ত্রিশ আর চল্লিশ দশকের অত্যুন্নত ইউরোপকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশের কাছে পরম পূজনীয় দেবতার আসন পেতে শুরু করেছেন সাম্প্রতিক কালে। যুগোস্লাভিয়ার নরপিশাচ মিলোশোভিচ লক্ষ লক্ষ বজনিয়ান আর কসোভানদের রক্তে আকাশমাটি রক্তরাঙা করে দিয়ে স্লাভজাতির চিরস্মরণীয় বীরসন্তানে পরিণত হয়েছেন। বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদ, আশিতে মানুষ যার গলায় পরিয়েছিল ফুলের মালা, আর নব্বুইতে জুতার, তিনি বৃদ্ধবয়সে আবার পুষ্পমাল্যের সম্মান পেতে শুরু করেছেন, একই দেশের একই মানুষদের কাছ থেকে। জিম্বাবুয়ের লৌহমানব মুগাবি শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর দেশবাসীর কাছে হলেন আফ্রিকার বীরপুত্র, নির্যাতিত মানবতার পরম বন্ধু। সেই একই লোক ক্ষমতার অন্ধ তাড়নাতে দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে এখন এক অতল অন্ধকূপের মধ্যে পাগলের মত হাতড়াতে শুরু করেছেন। সব হারাতে রাজি তিনি, ক্ষমতা হারাতে রাজি নন। বিশ্বের সর্বোন্নত দেশের সর্বেসর্বা নেতা, যিনি আরো কিছুদিন বহাল থাকছেন ক্ষমতায়, যাঁকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়, তাঁর কীর্তিকাহিনীর কথা না'ই বা উল্লেখ করলাম আজকে। তাঁর ক্ষমতার কালোহাত আমার কলমের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিনা কে বলবে। ওই শব্দটি এখন কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা হাস্যরসের নাম। একটা অসুস্থ নতুন ব্যঙ্গ।

ক্ষমতা অনেক প্রকারের। এক, যা মানুষকে দৈহিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গৌত্রিক সঙ্ঘাত, দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, উলুখড়ের প্রাণ যায়, সেই পুরনো প্রবাদ এখনো চলে। ভিক্ষার জন্যে বাচ্চাদের ধরে ধরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া, যা এশিয়া-আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোত অহরহই ঘটছে, তার পেছনেও রয়েছে ক্ষমতার কালো হাত। ভাড়াটিয়া ঘাতক, গুপ্ত

অপরাধচক্র, মাফিয়া, ছায়ার শরীরে আস্ত মানুষকে চোখের পলকে গুম করে দেয়, ক্ষমতা। ভদ্রবেশী কুটিল ক্ষমতা হল যা মানুষকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। অর্থবান মানুষকে অধিকতর অর্থলাভের লোভ দেখিয়ে অর্থশূন্য করে ফেলে, তাকে অন্নহীন বস্ত্রহীন বাস্তুহারা শরণার্থীতে পরিণত করে। ১৯২৯-এ তার উদাহরণ দেখেছিলাম একবার। ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয়বার। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আরো একবার। আরো কতবার দেখতে হবে কে জানে। একে আমি বলি অর্থসন্ত্রাস। ধন যত জমা হবে বিশ্বভাণ্ডারে ধনের সন্ত্রাসও বাড়বে তত। এখানেও বাংলার সেই পুরনো প্রবাদটি পূর্ণভাবে প্রযোজ্য ঃ রাজায় রাজায় যুদ্ধ, জান যায় উলুখড়ের।

কিন্তু সব ক্ষমতার বড় ক্ষমতা হল যা মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে। যা মানুষের বুদ্ধিকে, চিন্তাকে, সঙ্কুচিত করে রাখে। এবং এমনভাবে করে, এমন সূক্ষ্ম চাতুর্য ও যত্নের সঙ্গে, যে সে-মানুষটি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারেই নিজেকে সমর্পণ করে সেই পঙ্গুকরণীয়া শক্তির কাছে। পঙ্গুকৃত মানুষটিকে তখন দেখতে মনে হয়ে যেন কোনও শৌখিন জাপানী পরিবারের কাচের আলমিরাতে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা বনসাই করা বনস্পতি। যাকে বনের ভেতরে ছেড়ে দিলে হয়ত হতে পারত বিশাল বটবৃক্ষ, কিন্তু হয়নি মণিমুক্তা খচিত তারের বেড়াতে নিখুঁতভাবে জড়িয়ে থাকার কারণে। অবরুদ্ধ মানুষের মনও তেমনি তারের বেড়াতে জড়িয়ে থাকে আজীবন, তার অজান্তে। এই ক্ষমতা মনকে সম্প্রসারিত হতে দেয় না, অনুসন্ধিৎসু হতে দেয় না। মানুষকে সংশয়ী হতে বারণ করে, উৎসুক কৌতূহলী হতে বারণ করে, দুর্বিনীত প্রশ্নকারী হতে বারণ করে। তাকে ডুবতে দেয় না অথৈ সমুদ্রগর্ভে, উড়তে দেয় না নির্বন্ধ ব্যোমাকাশে, পদার্পণ করতে দেয় না কোন নিষিদ্ধ রহস্যপুরীতে। শুধু বলে, উচ্চারণ কর, ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে উচ্চারণ কর। পালন কর। চোখ বুঁজে পালন কর। মন বুঁজে প্রাণ বুঁজে পালন কর।

এই ক্ষমতার নাম ...।

নাহ্, পারছি না উচ্চারণ করতে। আমার রা বন্ধ হয়ে আছে। আমার ঠোঁটে ঠোঁট জড়িয়ে আছে। দু'অক্ষরের ছোট্ট একটা শব্দ, তা'ও উচ্চারণ করতে পারছি না। একটা অদৃশ্য হাত, একটা চাপাস্বর, আড়ালে আমার কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। শব্দটির একটা নিজস্ব শক্তি আছে। যা আমাকে আলমিরার বনসাইতে পরিণত করেছে। আমার উড়ুক্কু মনকে খাঁচায় ভরেছে, এবং সোনার তার দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে সেই খাঁচার প্রবেশ পথটিকে। তাই আমিও ওদের সঙ্গে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে উচ্চারণ করে যাচ্ছি, যা আমি জন্ম থেকে আদিষ্ট হয়েছি উচ্চারণ করতে। আমার কণ্ঠে যে উচ্চারণ সে আমার উচ্চারণ নয়, অন্য কারো। সে আমার কেউ নয়, তবু তার কণ্ঠই আমার কণ্ঠ। আমি তার উপনিবেশ। আমি তার পোষ্য প্রাণী।

তার নাম ধর্মীয় গোঁড়ামি। একটা শব্দকে লম্বা করে দু'টো বানিয়ে ফেললাম। আমার ক্ষমতাবান প্রভুটিকে শান্ত রাখার আশাতে। একটি পরমাণুর যে শক্তি দু'টির অণুতে তা হ্রাস পেয়ে যায় কিঞ্চিৎ, সেই আমার ভরসা। তবু তার তেজ আণবিক শক্তির চেয়ে কম নয়। যুগে যুগে একের পর এক জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে তার রোষের আগুনে। রক্তের লহরবন্যা বয়েছে নিরীহ গৃহস্থের শস্যক্ষেত্রে। এ-শক্তির প্রমত্ত প্রতাপ শত শত বাসভূমিকে পরিণত করেছে শ্মশানভূমিতে। ক্ষমতার প্রতীক এই মহাপ্রভুকে তুষ্ট করার জন্যে আদিযুগে এক মানুষ আরেক মানুষকে বলি দিত, মধ্যযুগে দিত ডাইনিবলি, বর্তমান যুগে দেয় বিধর্মীবলি আর অসতীবলি। যুগ বদলায়, জীবন বদলায়, সমাজ বদলায়, কিন্তু বলির সংস্কৃতি বদলায় না। এ ক্ষমতার ঈশ্বর যেন রক্তই ভালবাসে সবচেয়ে বেশি পূজার প্রসাদ হিসেবে। এখনো, এই পণ্যভার, প্রযুক্তিভার, অত্যাধুনিক যুগেও। এখনো জ্ঞানের বইয়ের চেয়ে অপজ্ঞানের বইয়ের মূল্য বেশি। এখনো বিজ্ঞানের বাণীর চেয়ে দৈববাণীর মূল্য বেশি। এখনো সেই বনসাইকৃত বনস্পতি হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চায়, ঐশীভিক্ষা, একবিন্দু দৈবকরুণা। এ-জীবনের জন্য নয়, এ-জগতের জন্য নয়, অন্য জগতের জন্য, যে-জগতের অস্তিত্ব কেউ কোনদিন প্রমাণ করেনি, কেউ কোনদিন প্রমাণ করতে পারবেও না। সে-জগত প্রমাণসাপেক্ষ নয়, কেবলি বিশ্বাসসাপেক্ষ। তবু, সে-জগতের জন্য সদ্যপ্রস্ফুটিত তরুণ ছেলে কোমরে বোমার বন্ধনী লাগিয়ে হাটবাজারের ভিড়ের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। সে-জগতের ঈশ্বর এ-জগতের সকল সুন্দরকে ধ্বংস করে পরজগতের এক অলীক দৃশ্য রচনা করে দেয়। এমনই আশ্চর্য শক্তি তার যে স্রষ্টার গাত্র নিয়ে যার জন্ম সে'ও একসময়, অলক্ষ্যে, অজান্তে, ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই ক্ষমতার প্রমত্ত আস্ফালন আমরা, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি '৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইতিহাসের সেই বিপুল প্রলয়ের মধ্যে, সেই বিশাল তরঙ্গের মধ্যে, ক্ষণিকের জ্যোতি নিয়ে উদয় হয়েছিল নতুন এক সূর্য। স্বাধীনতার সূর্য, শেকলভাঙার সূর্য। আদিমতার আসুরিক শক্তি সেই ক্ষণজ্যোতির মধ্যে বাধ্য হয়েছিল নতশিরে পরাজয় বরণ করতে। কিন্তু পরাজয় মেনে পরাজিত থাকার মত দুর্বল শক্তি সে ছিল না, সে-কথা আমরা তখন বুঝিনি, এখনো বুঝি না। '৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সেই অশুভ শক্তি, সেই পাকিস্তানী মদদপুষ্ট রাজাকার, ক্ষমতা হারিয়েছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু '৭৫-এর আগস্ট আর নভেম্বর মাসে, বিশেষ করে জাতির দ্বিতীয় জনক মহামান্য জিয়াউর রহমানের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতায়, সে-ক্ষমতা তারা পুনরুদ্ধার করে। আজকে বাংলাদেশের পথেঘাটে, রাষ্ট্রভবনে আর

বাণিজ্যভবনে, যাকিছু ঘটছে সবই সেই '৭৫-এর প্রতিফল। আজকের ঘটনাসমূহ কোন চিন্তাশীল পর্যবেক্ষককে অবাক করবে না। যাদের করবে তারা আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাষের খবর রাখেনি।

আজকে বাংলাদেশে সত্যিকারের মুক্তমনা প্রগতিশীল বলতে কেউ আছে কিনা জানি না। থাকলেও তারা ঘর থেকে বেরুতে সাহস পায় না। অথচ লোকে বলে বাংলাদেশে বাকস্বাধীনতা আছে। কেউ কেউ বড়াই করে বলে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে ততটা স্বাধীনতা তৃতীয় বিশ্বের আর কোন দেশের মিডিয়াতে নেই। তাই নাকি ? তাই যদি হয় তাহলে পত্রিকায় তুচ্ছ একটা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য প্রকাশককে প্রকাশ্যে, অপমানজনকভাবে, ক্ষমা চাইতে হয় কেন ধর্মের পাণ্ডাদের কাছে ? স্বাধীনতাই যদি থাকে তাহলে নিজের ঘরে বসে 'আল্লা হাফেজ'-এর পরিবর্তে 'খোদা হাফেজ' বলে এদিক-ওদিক তাকাতে হয় কেন ? তাহলে ধর্মবিষয়ে সামান্যতম নেতিবাচক প্রশ্ন তুলে কিছু লিখলে বা বললে সম্পাদক আর প্রকাশকের হাঁটু কাঁপতে শুরু করে কেন ?

না ভাই, বাংলাদেশ পাতালমুখী হচ্ছে না, পাতালবাসী হয়ে গেছে। প্রবাসে অনেকেই হাহুতাশ করে বলে, কোথায় যে যাচ্ছে দেশটা ! না, যাচ্ছে না কোথাও, যেখানে যাবার সেখানে চলেই গেছে। নতুন করে যায়নি, '৭৫এ'ই চলে গিয়েছিল। আজকে আমরা যা দেখছি তা সেই পাতালপুরীরই দৈনন্দিনের দৃশ্যাবলী। যে দেশকে আমরা সেধেছিলাম '৭১-এ, পেয়েছিলাম '৭২-এ, সে-দেশ আমাদের হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। নতুন করে হারাবার কিছু নেই। ঐ যে শক্তির কথা বললাম আমি, যে শক্তিকে প্রতিরোধ করবার শক্তি আমাদের কোনদিনই ছিল না আসলে, সেই শক্তি বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। '৭১-এর পাকিস্তান বাহিনী যা পারেনি তাদের কামান আর বন্দুক দিয়ে, জামাত আর আরব-তালেবানের কালো হাত তার চেয়ে হাজার গুণে বেশি আদায় করে নিয়েছে আমাদের সোনার বাংলার সোনার মানুষগুলির কাছ থেকে। আজকে তাদের কাছে যতটা পূর্ণাঙ্গিনভাবে আত্মসমর্পণ করেছি আমরা, তার একাংশ আত্মসমর্পণও তারা করেনি ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসে। আমাদের একদিনের বিজয়কে আমরা সমর্পণ করেছি তাদের চিরবিজয়ের মণ্ডপে। সেই কারণেই বাংলাদেশে কেউ আজকে 'জয় বাংলা' বলে না—উচ্চারণ করতেই সাহস পায় না। তার বদলে বলে 'আল্লা হাফেজ।' বলে, 'নামাজের সময় হয়ে গেল।' 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতাহু, ওয়া বারকাতাহু।' 'আপ্‌কা তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় ?' 'জ্বিহাঁ, আপকা দোয়াসে।' (এই হল আমাদের স্বাধীন বাংলার দৈনন্দিন আলাপচারিতার ধারা)।

সেদিন পত্রিকায় পড়লাম, কোন এক গণ্যমান্য ব্যক্তি মতামত প্রকাশ করেছেন যে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে গতানুগতিকভাবে যে সব আচার-অনুষ্ঠান হয়ে আসছে দেশে তার বেশির ভাগই 'হিন্দুয়ানি !' এতে মন খারাপ করার কিছু নেই। যে-কথাটি অনেকের মনেই অনেকদিন থেকে খোঁচাচ্ছিল সে-কথাটিই তিনি প্রকাশ্যে বলে ফেললেন। এই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রভাতফেরি নিয়ে প্রতিবছর শহীদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এই যে তারা সমবেত গলায় গায় 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী,' 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', এসব কি কোনদিন আরবদেশের পবিত্র কাবাশরিফের চত্বরে করতে দেবে ? নাকি দেবে বড়পীরের মাজার শরিফে ? শহীদ মিনার তো কুফরি জিনিস, শয়তানের মূর্তি, আল্লাপাকের সাক্ষাৎ শরিক—স্বভাবতই এটাকে তারা হিন্দুয়ানি বলবে। তাদের চোখে বাংলাদেশ হল মুসলমান দেশ—বিসমিল্লা বলে সকালেবেলার সব কাজ শুরু হবে, আলহামদুলিল্লা আর ইনশাল্লা বলে দিনমানের কাজ শেষ হবে, এই হল ইসলামি তরিকা। মুসলমান দেশ মুসলিম উম্মাকে অনুসরণ করবে, তারা কেন মুসলমানের জাতশত্রু হিন্দু-ভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মূর্তিপূজাতে যোগ দেবে প্রতিবছর ? ঠিকই বলেছেন উপদেষ্টা সাহেব—হিন্দুয়ানি কাজকর্ম ভাল নয় আখেরের জন্য !

অতীতে আমি দেশের ছাত্রসমাজের নৈতিক দুর্দশা নিয়ে মন্তব্য করেছি দু'চারবার। দুঃখপ্রকাশ করেছি যে তারা একসময় কথায় কথায় নিশান নিয়ে আন্দোলনে বেরিয়ে পড়ত, সামান্য ছুতোতে হরতাল ডেকে নগরজীবন অচল করে দিত, অথচ আজকে জাতির এই চরম দুর্দিনে তারা এত নিশ্চল নিশ্চুপ কেন। আজকে যখন আরবের দূষিত তেলের টাকায় মোল্লারা রাস্তায় নেমে 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান' বলে অশ্লীল স্লোগান দেয় বুক ফুলিয়ে, তারা কিসের নেশায় ক্যাম্পাসের কোণাতে বুঁদ হয়ে বসে থাকে ? সেই আক্ষেপ এখন আর করি না আমি। লাভ নেই। সময় ফুরিয়ে গেছে। আমাদের ছাত্রসমাজের সেই আগুনটা অনেক আগেই নিভে গেছে। তার বদলে আজকে আন্দোলনে নেমেছে বাংলাদেশী তালেবানরা। তারা বাংলার শিল্পকলার যাকিছু দৃশ্যমান প্রতীক সব ধ্বংস করে দেবে। শতবর্ষের শত বাঙালির শত সাধনায় গড়া স্মৃতিস্তম্ভ সব ধ্বংস করে দেবে। ভাস্কর্যশিল্প তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে দেশ থেকে—মূর্তি, যে কোন মূর্তি, তাদের স্রষ্টাকে ক্ষুব্ধ করে, রুষ্ট করে। তারা মানুষের সৃষ্টিকে বিশ্বাস করে না, তারা আনন্দকে মানুষের জীবন থেকে নির্বাসিত করতে চায়, তারা কাউকে গাইতে দেবে না, কাউকে নাচতে দেবে না, কাউকে হাসতে দেবে না, ভাবতে দেবে না যা ভাবার মত, চাইতে দেবে না যা চাওয়ার মত, খুঁজতে দেবে না যা খোঁজার মত।

তারা শুধু পাকিস্তানই ফিরে পেতে চেয়েছিল। আমরা সোনার থালায় করে পাকিস্তানই দিইনি শুধু, আফগানিস্তান, আরব, ইরান, ইরাক—একসাথে সবই দিয়ে ফেলেছি। '৭৫-এর দু'টি ঘটনার শেষ পরিণতি আজকে আমাদের সোনার বাংলার এই হীনদশা।

প্রবাসের দু'চারজন বন্ধু বলছেন, না ভাই, এগুলো সাময়িক। দেখবেন বাঙালি কেমন তেজের সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। আমি হাসি। বাঙালি কোথায় আজকের বাংলাদেশে ? অসংখ্য নামাজী আছে, অগনিত হাজী আছে, সীমাহীন পীরের মুরিদ আছে, কিন্তু বাঙালি ? বুদ্ধিজীবীদের বাঙালি বলছেন ? হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁরা বাঙালি, অত্যন্ত গুণীমানী বাঙালি। কিন্তু তাঁরা তো ভাই ফ্ল্যাট বানানোর কাজে ব্যস্ত। কিম্বা মেয়ের বিয়েতে, ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাতে, কোচিং স্কুলের ছাত্র বাড়াতে, নতুন বইয়ের প্রকাশক খুঁজতে। তাঁদের সময় কোথায় ওসব করার। দরকার হলে তাঁরা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেবেন, দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার দেবেন, বিবৃতি দেবেন জনসভায়, কিন্তু আন্দোলন ? ছি ঃ। বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত। তাঁরা বুদ্ধি দেবেন। আন্দোলনকারীরা সে বুদ্ধিকে কাজে ফলাবে, এই হল নিয়ম। ঠিক তাই তো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। বুদ্ধিজীবীরা কোলকাতার হোটেলে বসে বোতল নিয়ে 'জয় বাংলা' করলেন, আর মাঠের ছেলেরা বৃষ্টিবাদলায় কাদায় মাটিতে একাকার হয়ে প্রাণ দিল দেশের জন্য। আমি কি বলি জানেন ? আজকে দেশের যে শোচনীয় অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে তার সিংহভাগ দায়ই কিন্তু আমাদের এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জাতটারই। অর্থাৎ আমারই মত বাকসর্বস্ব বুদ্ধিওয়ালাদের।

ধর্ম একসময়, আমার বাপদাদার যুগে, ব্রিটিশ আমলে, এমনকি পাকিস্তান শাসনেরও প্রথম দিকটায়, একটা শান্তি ও প্রীতির প্রতীক ছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর দুঃখকষ্টের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে খানিক পরিত্রাণ তারা খুঁজে পেত মসজিদে-মন্দিরে-গীর্জায়। মোল্লামৌলবীদের এই যে ভয়াবহ রণমূর্তি আজকে, সেকালে সেটা ছিল একেবারেই অভাবনীয়। সেকালে ধর্ম ছিল একটা ধ্যান। আজকে ধর্ম হয়েছে একটা নেশা। সবচেয়ে বিড়ম্বনা হল এই যে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ধর্মের রাজনৈতিক বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, অথচ বিচ্ছিন্ন হবার পরপরই যেন গোটা দেশটা সেই বেষ্টনীর ভেতর হুড়মুড় করে জড়িয়ে পড়ল। এখন বাংলাদেশে ধর্ম একটা সার্বক্ষণিক জপের নাম—দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্তই যেন এই জপের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সেখানে ধর্ম শুধু মসজিদের মিনারে নয়, মুসল্লিদের জায়নামাজে নয়, কিশোরের টুপি আর পায়জামাতে নয়, মোল্লার রেহেল, কুমারীর হিজাব আর অজুর বদনাতে নয়, ধর্ম মানুষের দেয়ালে দেয়ালে, মাঠে ময়দানে, মানুষের গোসলখানায়, শোবার ঘরে, পাকের ঘরে, মেঝের মাদুরে। ধর্ম সেখানে ব্রত নয়, বোতল। একপ্রকার বায়বীয় মদের বোতল, যা পান করে আবালবৃদ্ধবণিতা মাতাল হয়, উত্তাল হয়, জ্ঞান হারায়, বুদ্ধি হারায়। বাংলাদেশ এমন এক দেশ এখন যেখানে মুরগির পেট থেকে ডিম বের হয় আরবি হরফে আল্লার নাম লেখা নিয়ে, যেখানে নবজাত শিশু কোরাণে হাফেজ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, যেখানে স্বপ্নের ঘোরে ফেরেশতার আদেশপ্রাপ্ত পিতা তার শিশুসন্তানকে কোরবানি দেয় আল্লার ওয়াস্তে। বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে লাভজনক হল পীরের ব্যবসা। সবচেয়ে লোভনীয় সম্পত্তি হল পীরের দরগা। চল্লিশ আর পঞ্চাশ দশকের সেই শান্ত নিরীহ মৌলবী এখন রক্তচক্ষু, ক্ষমতালোভী, আগ্রাসী মৌলবী, যে আপনার-আর-আমার রক্তের মূল্যে অর্জিত দেশটাতে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় আপনার-আর-আমার ভাল'র জন্যে নয়, ইসলামেরই ভাল'র জন্য, আল্লার জন্য। একাত্তরে তারা সফল হয়নি কারণ ধর্ম তখনও আমাদের নেশা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন হয়েছে, সুতরাং এখন তারা অনায়াসে আমাদের কাবু করে দেবে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে তালেবান আর আলকায়দার ঘাঁটি স্থাপনের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা কোথায় এমুহূর্তে ? ইরান বা আফগানিস্তান এখন আর নিরাপদ নয়, পাকিস্তানেও বাতাস উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে, মধ্যপ্রাচ্যে তেলের মালিকরা পাত্তা দেবে না, মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়াতেও বেশি সুবিধা হবে না। সুতরাং বাকি রইল একমাত্র আমাদের এই অভাগা দেশটি—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। এই সোনার বাংলার প্রতিটি স্বর্ণকণা একদিন অশ্রুকণা হয়ে ঝরতে থাকবে ইতিহাসের গণ্ডদেশে।

তাহলে কি আশা নেই একেবারে ? আছে। আশা ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে ? তবে আশা নেই যদি এখনো সেই পুরনো "বাংলাদেশে কোনদিন ধর্মীয় বাড়াবাড়ি হতে পারে না" জাতীয় অচল মুদ্রা ভাঙাতে চেষ্টা করি বাজারে। দেশে গিয়ে দেখুন কি অবস্থা। খুঁজে দেখুন ক'টি লোক পাবেন আপনি গুলশান-বনানী আর বারিধারার নব্যধনী পাড়ায় যারা ওই মূর্খ উপদেষ্টার সঙ্গে একমত নয় যে একুশে ফেব্রুয়ারী একটি হিন্দুয়ানি ঘটনা। খুঁজে দেখুন বাংলাদেশের শিক্ষিত বনেদী সম্প্রদায়ের ক'জন মানুষ মৌলবীদের মূর্তি ভাঙার উন্মত্ততাকে মনে মনে সমর্থন করছেন না। খুঁজে দেখুন ক'জন বুদ্ধিজীবী এখনো হজ্ব করতে যাননি, এখনো বাৎসরিক কোরবানিতে বছরের গোটা সঞ্চয় ব্যয় করেননি, ক'টি মানুষ স্কুল-হাসপাতাল-আশ্রম গড়ার জন্য ক'পয়সা দান করেছেন সারা জীবনে, আর নিজের গ্রামে মসজিদ স্থাপনের জন্য দিয়েছেন কয় লক্ষ টাকা। এ-কাজগুলো যদি এখনো করে না থাকেন আপনি তাহলে আপনি কিছুতেই বুঝবেন না কেন সেই পুরনো বচন এখন আর কাজে লাগবে না।

অটোয়া,
৩রা নভেম্বর, ২০০৮
মুক্তিসন ৩৭